দৈনিক মাধুকর | সোমবার | রেজিঃ রাজঃ ২৬৬ | গাইবান্ধা বর্ষ ১৮, সংখ্যা ৫৩ | ২৫ ফাল্গুন ১৪৩১ বাংলা | ৯ রমজান ১৪৪৬ হিজরি | পৃষ্ঠা ৪, মূল্য ৩ টাকা | ১০ মার্চ ২০২৫ ইং | শেষ পৃষ্ঠা

'দুর্যোগের পূর্বাভাস প্রস্তুতি-বাঁচায় প্রাণ ক্ষয়ক্ষতি'

জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০২৫

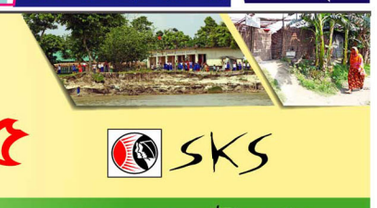

বিশেষ ক্রোড়পত্র | ১০ মার্চ, ২০২৫ | এসকেএস ফাউন্ডেশন

জানমাল রক্ষায় প্রয়োজন, আগাম দুর্যোগ-প্রস্তুতি গ্রহণ

আজ ১০ মার্চ, জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য "দুর্যোগের পূর্বাভাস প্রস্তুতি, বাঁচায় প্রাণ ক্ষয়ক্ষতি"। এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আজ জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস পালন করা হচ্ছে। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি সহনীয় পর্যায়ে রাখতে বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজসহ সর্বস্তরের জনগণকে সচেতন করাই জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস পালনের উদ্দেশ্য।

জলবায়ু সংক্রান্ত বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশ সরকার খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রায়শই জীবন রক্ষাকারী ভূমিকা পালন করছে। বিভিন্ন দুর্যোগের ক্ষতি মোকাবেলায় অনতিবিলম্বে পদক্ষেপ গ্রহণ ও ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করার একটি উপায় হলো জলবায়ু সংক্রান্ত বিভিন্ন ঝুঁকি সম্পর্কে আগাম ধারণা করা। আমাদের লক্ষ্য হলো সম্ভাব্য দুর্যোগ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগোষ্ঠীকে আগাম সচেতন করা, যাতে তারা প্রস্তুতি নিতে পারে এবং সম্ভাব্য ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনতে পারে।

ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশে প্রতিবছরই বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়ে থাকে। প্রায় সারা বছরই বাংলাদেশকে কোনো না কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হচ্ছে। সঠিক সময়ে যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করা গেলে এসব দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমিয়ে রাখা সম্ভব।

সাম্প্রতিক সময়ে দুর্যোগ নিয়ে পূর্বপ্রস্তুতি ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে দুর্যোগে প্রাণহানি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে দুর্যোগ মোকাবিলায় চিরাচরিত 'দুর্যোগ পরবর্তী সাড়াদান ব্যবস্থাপনা' থেকে 'আগাম ব্যবস্থাপনা' কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমেছে।'

বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও একটি শক্তিশালী ও কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে সময়োপযোগী আইন, বিধি, পরিকল্পনা, দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের ওপর গুরুত্বারোপ করে 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' প্রণয়ন করা হয়েছে।'

এসকেএস ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের দুর্যোগপ্রবণ একটি জেলা গাইবান্ধায় ১৯৮৭ সালে কার্যক্রম শুরু করে। বিগত প্রায় চার দশকে এসকেএস ফাউন্ডেশনের অভিজ্ঞতা হলো সঠিক সময়ে যথাযথ প্রস্তুতি নেয়া গেলে দুর্যোগের ঝুঁকি এবং জানমালের ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমানো সম্ভব। বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ দুর্যোগে পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে থাকে। দুর্যোগ মোকাবেলায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে দুর্যোগে প্রাণহানি কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে দুর্যোগ মোকাবিলায় চিরাচরিত 'দুর্যোগ পরবর্তী সাড়াদান ব্যবস্থাপনা' থেকে 'আগাম সতর্কতা' কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা। ভৌগলিকভাবে দুর্যোগপ্রবণ দেশ এবং বিভিন্ন প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সরকার একটি শক্তিশালী ও কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়তে 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' প্রণয়ন করেছে।

এসকেএস ফাউন্ডেশন জন্মলগ্ন থেকেই দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের পাশে থেকে তদের জীবন ও জানমালের ক্ষতি হ্রাস করতে ভূমিকা রেখে চলেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এসকেএস দুর্যোগ প্রস্তুতির উপর গুরুত্বারোপ করে, দুর্যোগ মোকাবেলায় আগাম ব্যবস্থা গ্রহণ করে দুর্যোগে মানুষের জানমালের ক্ষতি কমিয়ে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে। এভাবেই এসকেএস ফাউন্ডেশন দুর্যোগে মানুষের পাশে থাকতে অঙ্গীকারবদ্ধ। জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস ২০২৫ সফল হোক।

রাসেল আহম্মেদ লিটন
প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী প্রধান
এসকেএস ফাউন্ডেশন

দুর্যোগে ক্ষতি হ্রাসে আগাম প্রস্তুতি

মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম

১৯৯৭ সাল থেকে বাংলাদেশে মার্চ মাসের শেষ বৃহস্পতিবার জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস পালিত হয়ে আসছে। মন্ত্রীসভায় দিবসটি পালনের অনুমোদন দেওয়া হয় ২০১২ সালের ৭ নভেম্বর। ২০১৫ সালে দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস ও মহান স্বাধীনতা দিবস একই দিনে অর্থাৎ ২৬ মার্চ হয়ে যাওয়ায় ঐ বছর ৩১ মার্চ জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস পালিত হয়। মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ সম্মতি পত্রে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে মার্চের শেষ সপ্তাহের পরিবর্তে অন্য কোন দিনে এটি উদযাপন করার বিষয়ে নির্দেশনা দেয়। ২০১৬ সাল থেকে এ দিবসটি যথাযোগ্য আয়োজনের মাধ্যমে দেশব্যাপী ১০ মার্চ উদযাপিত হয়ে আসছে।

দিবসের গুরুত্ব :

এ দিবসটি পালনের গুরুত্ব বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ন। ভৌগোলিক অবস্থানজনিত ও মানবসৃষ্ট বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দুর্যোগ প্রবণ দেশ। বাংলাদেশের মানুষের দুর্যোগের মধ্যে বসবাসের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞান রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে দুরদর্শী ও বাস্তব উদ্যোগ নেওয়ার ফলে রোল মডেল হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। গত দুই দশকে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণেই জাতিসংঘ ও দুর্যোগপ্রবন দেশগুলোর প্রধ কাছ থেকে এসেছে স্বীকৃতি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উত্তরোত্তর নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের ইতিবাচক দিকগুলো তাত্ত্বিক ও প্রয়োগিক গবেষকদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। বিশেষত বিগত চার দশকে দুর্যোগের সঙ্গে বসবাস করা মানুষ, সমাজ ও প্রকৃতির উপর দুর্যোগের যে প্রভাব ও তার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের বিগত দুই দশকে নেওয়া বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপের চিত্র বিভিন্ন গবেষকদের গবেষণায় স্থান পায়। বিশেষ করে দুর্যোগে নারীর নাজুকতা ও অবদানকে স্বীকার করে নারীকে মূলধারায় যুক্ত করতে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে আমাদের দৃষ্টি বহুদাবিভক্ত বিভিন্ন ধরনের মানুষের উপর, যেখানে প্রতিবন্ধী মানুষ দুর্যোগ পরিস্থিতিতে যে ধরণের পিদাপন্নতার সম্মুখীন হয় সে অবস্থা মোকাবেলায় সরকার বিশেষ দৃষ্টি দিচ্ছে। বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণের সময় প্রতিবন্ধীদের ব্যবহার উপযোগী করে নির্মাণ করা হচ্ছে। তাছাড়া ট্রান্সজেন্ডার, বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও সমাজের বিভিন্ন বিপদাপন্ন পেশাজীবিদেরকে দুর্যোগের আগে সচেতনতা সৃষ্টি ও দুর্যোগকালে সম্ভাব্য পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুতি নিতে নানা উদ্যোগ নেয়া হয়ে থাকে। ১৯৭০ সালে প্রলয়কারী ঘূর্ণিঝড় উপকূলীয় এলাকায় ১০ লাখ মানুষের প্রাণহানি, গবাদি পশু ও অন্যান্য প্রজাতির দুর্দশা লাঘবে ১৯৭২ সালে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) চালু করা হয়।

দুর্যোগ প্রস্তুতি ঃ গাইবান্ধা প্রেক্ষিত

গাইবান্ধা জেলা ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ। গাইবান্ধাবাসীকে প্রতিবছর কয়েক দফা বন্যা মোকাবেলা করতে হয়। এছাড়া নদী-ভাঙ্গন, খরা, বজ্রপাত, অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি মোকাবেলা করতে হয়। সরকার ও বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) দুর্যোগ মোকাবেলায় একসাথে কাজ করে যাচ্ছে। ত্রাণ নির্ভর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা থেকে সরে গিয়ে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (DRR) কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে সারা বছরব্যাপী প্রস্তুতি গ্রহণ চলছে। এ ছাড়া পূর্বাভাস প্রচার ও পূর্ব প্রস্তুতি সমান তালে চলমান আছে। আগামী ১০ মার্চ দুর্যোগের "পূর্বাভাস প্রস্তুতি, বাঁচায় প্রাণ ক্ষয়ক্ষতি" এই প্রতিপাদ্য নিয়ে সারাদেশসহ গাইবান্ধা জেলায় যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হবে। আমি এই দিবসের সফলতা কামনা করি। বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সরকারের পাশাপাশি এই জেলায় বিভিন্ন এনজিও যেমন-এসকেএস ফাউন্ডেশন, জিইউকে, ফ্রেন্ডশিপ, ব্র্যাকসহ সবার সহযোগিতায় দুর্যোগ প্রস্তুতি ও মোকাবেলার কাজে সকলে অবদান রেখে চলেছে। আমরা আশা করি দুর্যোগ মোকাবেলায় সকলের এই সহযোগিতা ভবিষতেও অব্যাহত থাকবে। এই জেলায় ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির (সিপিপি) ন্যায় এফ.পি.পি (ফ্লাড প্রিপিয়াওনেস প্রোগ্রাম) এর আওতায় প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকগণ দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রশংসনীয় অবদান রাখবে।

উপসংহার :

দুর্যোগ প্রশমনের জন্য সর্বস্তরে সুশাসনের মাধ্যমে বাস্তবসম্মত পরিকল্পনার মাধ্যমে দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি অনেকাংশে কমানো সম্ভব। যেকোনো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে তিনটি বিষয়- (দুর্যোগ-পূর্ববর্তী প্রস্তুতি, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ-পরবর্তী পুনর্বাসন) সরাসরি জড়িত। সব ক্ষেত্রেই সরকারি-বেসরকারি সংস্থার পাশাপাশি আগামী প্রজন্মকে যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সক্ষম করে তোলা প্রয়োজন। এছাড়া কাঠামোগত ব্যবস্থার মাধ্যমে দুর্যোগকে কার্যকরভাবে প্রশমনের জন্য প্রস্তুতি নেয়া প্রয়োজন। যেমন-আধুনিক আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, খাদ্য সংরক্ষন ব্যবস্থার উন্নয়ন, রাস্তা/সেতু/বাঁধ নির্মাণ, বেতার যোগাযোগ সম্প্রসারণ ইত্যাদি। এ ছাড়া দুর্যোগ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে দক্ষ সেচ্ছাসেবক তৈরি, দুর্যোগ পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, দুর্যোগসহনীয় নিরাপদ আবাসন তৈরি কার্যক্রম গ্রহণ। এ ছাড়া দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে জনগণের পূর্বপ্রস্তুতি ও করণীয় সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার নিশ্চিত করা; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল গঠন; বহুমুখী নিরাপদ আবাসন ও আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ; আবহাওয়া পূর্বাভাস দ্রুত ও আধুনিকীকরণ; বাড়ির বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস সংযোগ নিরাপদ ও সতর্কভাবে স্থাপন সর্বোপরি দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনতে দুর্যোগসহনীয় নিরাপদ অবকাঠামো গড়তে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা, গাইবান্ধা।

শিক্ষার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও প্রতিকার

প্রদীপ রায়

জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান বিশ্বের এক ভয়াবহ বাস্তবতা, যা পরিবেশ, অর্থনীতি, এবং সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গভীর প্রভাব ফেলছে। বিশেষত, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এর বিরূপ প্রভাব আরও তীব্র। এটি কেবল প্রাকৃতিক পরিবেশকেই নয়, মানুষের জীবনযাত্রা এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকেও মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে। এটি এখন প্রতীয়মান যে, জলবায়ু পরিবর্তনের ফলেই ঘটছে প্রাকৃতিক ও মানব-সৃষ্ট দুর্যোগ, তাপমাত্রার পরিবর্তন, বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির মতো সমস্যাগুলো শিক্ষা কার্যক্রমের ওপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলছে। দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এই প্রভাবের শিকার হচ্ছে বেশি।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আবহাওয়ার আচরণে এক ধরণের তারতম্য আমরা লক্ষ্য করছি। আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে গরম, বর্ষা ও শীতের মৌসুমে পরিবর্তন হয়েছে। দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে চরমভাবাপন্ন বৈরি পরিবেশ। বিগত কয়েক বছর ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, চরম গরমের হাত থেকে শিক্ষার্থীদের রক্ষা করতে স্কুল-কলেজ সাময়িক বন্ধও ঘোষণা করতে হচ্ছে। গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, প্রাকৃতিক ও মানব-সৃষ্ট দুর্যোগের প্রবণতা ও প্রখরতা বাড়ছে। ফলে শিক্ষার্থীরা বছরের একটি লম্বা সময় বিদ্যালয় বা পাঠদান থেকে দূর থাকছে। শিক্ষার্থীদের এই পাঠগ্রহণ থেকে দূরে থাকাটাই তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই বিরতির সময় শিক্ষার্থীরা অন্যদিকে মনোনিবেশ করে ফেলে; স্কুলে যাওয়ার চেয়ে বাড়িতে বা মাঠে বা কোন আড্ডায় দিন কাটাতেই ঝুঁকে পড়ে। এভাবে অনেকেই ফেরা হয় না আর বিদ্যালয়ে, লেখাপড়ায়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও ভূমিধসের কারণে প্রান্তিক পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলো মারাত্মক অবকাঠামোগত ক্ষতির সম্মুখীন হয়। দুর্বল নির্মাণশৈলীর কারণে এসব বিদ্যালয় দুর্যোগের সময় সহজেই ধ্বংস হয়ে যায়। বিশেষ করে উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ের সময় বিদ্যালয়গুলো আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হলেও, পরবর্তী সময়ে শিক্ষা কার্যক্রম পুনরায় শুরু করতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। এ কারণে বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার ফলে অনেক বিদ্যালয় সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অনেক পরিবার তাদের জীবিকা হারায় এবং বাসস্থান পরিবর্তনে বাধ্য হয়। ঘূর্ণিঝড়, বন্যা বা খরার শিকার হয়ে অনেক পরিবার কাজের সন্ধানে অন্যত্র চলে যায়; যার ফলে শিশুরা স্কুলে যেতে পারে না। দীর্ঘ সময়ের অনুপস্থিতি শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার বাড়িয়ে দেয়। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর পরিবারগুলো শিশুশ্রমে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। শিশুরা গৃহস্থালি কাজ যেমন পান সংগ্রহ, বাজার করা, কৃষিকাজ ইত্যাদি করতে বাধ্য হয়। এক পর্যায়ে শিক্ষার ধারাবাহিকতা ভেঙে গেলে, তাদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। বিদ্যালয় বন্ধ থাকায় পাঠ্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। অনলাইন শিক্ষা কার্যক্রম চালু থাকলেও প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা বড় একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। অনেক শিক্ষার্থীর কাছে প্রয়োজনীয় ডিভাইস বা ইন্টারনেট সংযোগ নেই, যা তাদের পড়াশোনার পথ আরও কঠিন করে তোলে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট অনিশ্চয়তা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যে মারাত্মক প্রভাব ফেলছে। দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে বাসস্থান হারানো, খাদ্যাভাব, ও নিরাপত্তাহীনতা শিশুদের মধ্যে মানসিক চাপ ও উদ্বেগের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এই চাপ শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ও শেখার ক্ষমতা হ্রাস করে, যা তাদের শিক্ষাজীবনের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। পাশাপাশি বিশুদ্ধ পানির অভাব এবং পানিবাহিত রোগের প্রকোপ শিশুদের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায়; যা পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে বড় ধরণের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে।

এসকেএস ফাউন্ডেশনের গৃহীত পদক্ষেপ

বন্যা-প্রবণ চরাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলো যেন শিক্ষার পাশাপাশি আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়, সে জন্য এসকেএস ফাউন্ডেশন টেকসই ও দুর্যোগ-সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণে সহায়তা করছে। এ উদ্যোগের মাধ্যমে বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করার পাশাপাশি দুর্যোগকালীন সময়ে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হবে। শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ এবং পুনরায় শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করতে এসকেএস বিকল্প শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বৈকালিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে, যেখানে তারা হারিয়ে যাওয়া পাঠ পুনরুদ্ধার করতে পারে। পাশাপাশি, শিশুদের মানসিক ও শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখতে "খেলা ঘর" ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এখানে খেলাধুলার মাধ্যমে তারা মানসিক চাপ কমাতে, আনন্দ উপভোগ করতে এবং নতুন উদ্যমে শিক্ষায় মনোযোগী হতে পারে। কারণ শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও অবসাদ দূর করার জন্য খেলাধুলার গুরুত্ব অপরিসীম। অভাবী কিন্তু মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য এসকেএস ফাউন্ডেশন শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করছে; যা নানান ঘাত-প্রতিঘাতেও তাদের শিক্ষাজীবন অব্যাহত রাখতে সহায়তা করে যাচ্ছে। এসব উদ্যোগ শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে এবং শিক্ষার্থীদের উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। চরাঞ্চলের শিক্ষার ধারাবাহিকতা ও অগ্রগতি নিশ্চিত করতে এ ধরনের কার্যকর উদ্যোগগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জলবায়ু সহনশীল শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাবনা

১. টেকসই বিদ্যালয় অবকাঠামো নির্মাণঃ উপকূলীয় ও বন্যাপ্রবণ এলাকায় বিদ্যালয়গুলো এমনভাবে নির্মাণ করতে হবে, যা বন্যা বা ঘূর্ণিঝড় প্রতিরোধী হবে এবং দুর্যোগকালীন সময়েও ব্যবহারযোগ্য থাকবে। এই ধরনের টেকসই অবকাঠামো শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সহায়তা করবে।

২. আপদকালীন শিক্ষা কার্যক্রমঃ জরুরি অবস্থায় শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখার জন্য মোবাইল স্কুল, অস্থায়ী শিক্ষাকেন্দ্র, এবং ডিজিটাল শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন। এসব উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বা ঝরে পড়া রোধ করবে।

৩. জলবায়ু শিক্ষা অন্তর্ভুক্তকরণঃ শিক্ষার্থীদের জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করতে পাঠ্যক্রমে জলবায়ু শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এটি শিশুদের দুর্যোগ সম্পর্কে ধারণা প্রদান ও মোকাবিলায় সক্ষম করে তুলবে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পরিবেশবান্ধব জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত করে তুলবে।

৪. আর্থিক সহায়তা ও উপবৃত্তিঃ দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে হবে, যাতে তারা তাদের সন্তানদের লেখাপড়া চালিয়ে নিতে পারেন। দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ উপবৃত্তি কার্যক্রম চালু করা উচিত।

৫. বিদ্যালয় বন্ধ না রাখাঃ দুর্যোগের সময় বিদ্যালয় বন্ধ হওয়া রোধে বিকল্প ব্যবস্থায় শিক্ষা কার্যক্রম চালু রাখা জরুরি। এতে শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে এবং তারা পিছিয়ে পড়বে না। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব শিক্ষাব্যবস্থার জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই প্রভাব মোকাবিলায় টেকসই উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি। সরকার, সমাজ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে আমরা শিক্ষাব্যবস্থাকে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে সুরক্ষিত রাখতে পারি। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে শিক্ষার ব্যাঘাত একটি বহুমাত্রিক সংকট, যা প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আরও বেশি বিপদগ্রস্ত করে। তবে সঠিক পরিকল্পনা ও উদ্যোগের মাধ্যমে এই সংকট থেকে উত্তরণ সম্ভব। টেকসই অবকাঠামো, পাঠ্যক্রমে জলবায়ু শিক্ষার অন্তর্ভুক্তি এবং আপদকালীন সময়ে শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার মাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে একটি সমৃদ্ধ ও টেকসই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তোলা আবশ্যক।

দুর্যোগের আগাম সতর্কতাঃ আমাদের করণীয়

মোদাচ্ছেরুজ্জামান মিলু

বাংলাদেশে দুর্যোগ মানেই যুদ্ধ করে বেঁচে থাকার লড়াই। তাই কোনোকিছু না ভেবে দুর্যোগ মোকাবেলায় সকলকে শতভাগ সচেতন হওয়ার কোনো বিকল্প নাই। সরকার গণমানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিবছরের ১০ মার্চ জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উদযাপন করে আসছে। সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অধীন এবং অন্যান্য বেসরকারি সংস্থাসমূহে এই দিবস খুবই গুরুত্বের সাথে পালন করা হয়ে থাকে। এবারে ২০২৫ সালে সরকার জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উপলক্ষে প্রাণ ও ক্ষয়ক্ষতি রক্ষার্থে প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে- 'দুর্যোগের পূর্বাভাস প্রস্তুতি- বাঁচায় প্রাণ ক্ষয়ক্ষতি'। তাই প্রাণ ও ক্ষয়ক্ষতি রক্ষার্থে এই দিবসের প্রতিপাদ্যের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। দুর্যোগের সাথে লড়াই করতে করতে মানুষ এখন অনেক সচেতন হয়েছে। দুর্যোগ বিষয়ে মানুষের ধারণা থাকলেও এ বিষয়ে সতর্ক হওয়ার জন্য যতটা সচেতন হওয়া দরকার, ততটা এখনও হয়নি। দুর্যোগে যেন জানমালের ক্ষয়ক্ষতির কারণ না হয় সেজন্য সরকারের পক্ষ থেকে আগাম সতর্কবার্তা জানিয়ে দেওয়া হয়।

আমাদের দেশে আমরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মানবসৃষ্ট দুর্যোগ দেখতে পাই। জানমালের ক্ষয়ক্ষতি স্থানীয় পর্যায়ে সহনীয় রাখতে সরকার সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই দিবসে ব্যাপক আলোচনা ও প্রচারণা করে থাকে। যেকোনো দুর্যোগ থেকে জানমাল বাঁচাতে আগাম সতর্কবার্তা তৃণমূল পর্যায়ে পৌছে দেওয়ার জন্য সরকার ও কিছু বেসরকারি সংস্থা চেষ্টা করে যাচ্ছে। আমরা সচরাচর যে দুর্যোগগুলির মুখোমুখি হই সেগুলি হচ্ছে- ঘূর্ণিঝড়, বজ্রপাত, টর্নেডো, বন্যা, খরা, শৈত্যপ্রবাহ, অগ্নিকান্ড, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প ইত্যাদি। এ ছাড়াও আমরা করোনার মতো মহামারিও দেখলাম যে দুর্যোগে অনেক মানুষ মারা গেছে। অনেক দুর্যোগের মধ্যে বন্যার সময় আগাম সতর্কতা হিসেবে আমরা দেখতে পাই চরাঞ্চলে বা নদীবেষ্টিত এলাকায় ঘর-বাড়ি উঁচু করে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। বন্যার সময় আমাদের খুবই গুরুত্বের সাথে কিছু জরুরি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং সেইসাথে কিছু করণীয় অবশ্যই পালন করতে হবে। যেমন (১) প্রস্তুতি হিসেবে এলাকায় ঘটে যাওয়া সবচেয়ে বড় বন্যার পানির উচ্চতাকে বিবেচনায় রেখে ভিটাবাড়ি উঁচু ও মজবুত করে ঘরবাড়ি বানানো; (২) বসতভিটার ভাঙন রোধে বাড়ির আশেপাশে বাঁশ ও কলাগাছসহ অন্যান্য গাছ বেশি করে রোপন; (৩) আগে থেকেই আশ্রয়কেন্দ্র খুঁজে রাখা এবং চাল-ডাল ও শুকনো খাবার মজুত রাখা; (৪) খাবার স্যালাইন, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, ফিটকিরি ও প্রয়োজনীয় ওষুধ সাথে রাখা; (৫) বন্যাকালীন সাপের উপদ্রব মোকাবিলায় কার্বলিক এসিড ঘরে রাখা (৬) পরিবারের সকলের সাঁতার শেখা; (৭) গর্ভবতী নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী, বয়স্ক মানুষদের আগেভাগেই নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা; (৮) বজ্রপাতের সময় ঘর থেকে বের না হওয়া; (৯) বাড়িতে বজ্রনিরোধক দণ্ড স্থাপন নিশ্চিত করা; (১০) মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, টিভি, ফ্রিজসহ সকল ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম ব্যবহার থেকে বিরত থাকা; ইত্যাদি। প্রযুক্তির বিকাশে প্রযুক্তির ব্যবহার দিন দিন বেড়েই চলেছে। চরাঞ্চলে বা নদীবেষ্টিত এলাকায় মানুষ কিভাবে আগাম বার্তা পায় সেটাও আমাদের যাচাই করে দেখতে হবে যে, মানুষ সঠিক সময়ে সঠিক বার্তা পাচ্ছে কি না। মাইকিং করে জানিয়ে দেওয়া হয়; কিন্তু সকলে সেই বার্তা জানতে পারলো কি-না সেটা নিশ্চিত করতে হবে। জনগণের মাঝে সতর্কবার্তা পৌছানোর ক্ষেত্রে অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যেমন- নদীর পানির স্তর পর্যবেক্ষণ নিয়মিতভাবে করা হয় না। পানির স্তর বা লেভেল

দেখার জন্য লেভেল মিটার সব জায়গাতে নেই। মিটার দেখার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিও নেই সব স্থানে। আবার যেখানে আছেন, তিনি রিপোর্ট কোথায় পাঠাচ্ছেন? সেই রিপোর্ট